লাতিন আমেরিকার লেখিকাদের গল্প প্রসঙ্গে কিছু কথা

ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

লাতিন আমেরিকা হিসেবে চিহ্নিত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মোট সাতাশটি দেশ চিরকাল কমবেশি সমস্যায় জর্জরিত। এই সমস্যার নানা ধরন। যেমন ঔপনিবেশিক আগ্রাসন, গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি, অশিক্ষা, মহামারী। যথারীতি সেখানকার সাহিত্যিকেরা এসব এড়িয়ে যেতে পারে না। তবে, সমস্যার বিষণ্ণকরুণ ছবি নয় শুধু, জীবনের অমেয় সম্ভাবনাও চিহ্নিত হচ্ছে তাঁদের লেখায়। সংকীর্ণ দেশীয় গন্ডী পেরিয়ে তা পৌঁছচ্ছে বিদেশি পাঠকের দরবারে। এই সাফল্যের সূত্রে লাতিন আমেরিকার লেখকরা যেমন আন্তর্জাতিক পাঠকের মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছেন তেমনি লেখিকারাও পিছিয়ে নেই খুব। জীবনের চলস্রোতের তরঙ্গগুলো তাদের অনুভবেও ধরা দিচ্ছে গভীর তাৎপর্যে। সমকালকে তারা বিশ্লেষণ করছেন স্পর্ধিত স্বরে। তাদের রচনাতেও ফুটে উঠেছে প্রবহমান কালের আধারে সমাজব্যবস্থার কাঠামো। তার প্রকাশ্য ও গোপন কার্যকলাপ।

এসব অবশ্য রাতারাতি অর্জন নয়। লাতিন আমেরিকার লেখিকারা যে আজ অনেকটা আপোসহীনভাবে লিখতে পারছেন তার পেছনে অবদান অনেকের, বিশেষ করে যাঁরা নারীর অধিকার নিয়ে অক্লান্ত লড়াই করছেন দীর্ঘকাল। ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন আজকের লেখিকাদের জন্যে।

মায়া ও আজটেক-এর প্রি-কলাম্বিয়ান সাহিত্যকে বাদ দিলে প্রথম সম্মানীয় লাতিন আমেরিকার লেখিকা একজন মেক্সিকান সন্ন্যাসিনী। নাম সিস্টার হুয়ানা ইনেস্ দে লা ক্রুস্ (Sister Juana Ines de la cruz, 1648 - 1695). ছোটবেলা থেকে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আকৃষ্ট করেছিল সবাইকে। সেন্ট জেরোমের আদর্শে অনুপ্রাণিত সন্ন্যাসিনীদের দলভুক্ত হবার পর থেকে তিনি প্রচুর কবিতা, ব্যঙ্গ রচনা, নাটক ইত্যাদি লিখতে থাকেন স্পেনীয় নাট্যকার ও কবি কালদেরোন্ দেলা বারকা (Calderon de Ia Barca, 1600 - 1681)-র ধরনে। সঙ্গে সঙ্গে গির্জা কর্তৃপক্ষ এর প্রতিক্রিয়া জানালেন। বন্ধ করতে বললেন এই লেখালেখি। তাঁরা যা বলেছিলেন তার সারমর্ম, একজন সন্ন্যানিসীকে অন্তত এসব মানায় না। ধর্মীয় কবিতা লিখলে না হয় কথা ছিল। এর উত্তরে হুয়ানা ইনেস্ লিখে ফেললেন 'আন্সার টু সিস্টার ফিলোতেয়া দে লা ক্রুস্'। এতে তিনি নারীর জ্ঞান অর্জনের অধিকারের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করলেন। এই সঙ্গে তীব্র সমালোচনায় বিঁধলেন পুরুষশাসিত সমাজকে। গির্জাকেও আক্রমণ করলেন ইনেস্। বললেন, গির্জাকে নিয়ন্ত্রণ করছে বিরুদ্ধবাদীদের চিহ্নিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়। যথার্থ কোন ধর্মচিন্তা নয়। গির্জার পরিবেশে শিল্পচর্চার অবকাশ কোথায়? সত্যিকারের শিল্পচেতনা তো ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলোর বোধেরই বাইরে। কেন লিখবো তবে ধর্মীয় বই?

জীবনের শেষ দিকে গির্জা ও সমাজের চাপ এত বেড়ে গেল যে হুয়ানা ইনেস্ বাধ্য হলেন চার হাজার বইয়ে সমৃদ্ধ নিজস্ব লাইব্রেরি, গানবাজনার সরঞ্জাম (যেগুলো তিনি আশ্চর্য দক্ষতায় বাজাতেন বলে শোনা যায়) ও বিজ্ঞান - গবেষণার যন্ত্রপাতিগুলো বেচে দিতে। বাকি জীবন তিনি কাটালেন প্রার্থনা ও নানা দানধ্যানে।

তাঁর একটি কবিতা (অনুবাদক রিচার্ড আউটরাম) প্রায়ই উল্লিখিত হয় তার স্পষ্টভাষণের ধরন বোঝার জন্য। এখানে তার কিছুটা তুলে ধরা হল :

You stupid men, who will defame
all womankind, and baselessly,
blind to the fact that you might be
the cause of just that which you blame;
if with unequalled ardour you
pay constant court to their disdain,
how have them virtusous remain
and still incite them sinful too?
You fight till their resistance sways,
and later solemnly declare
that what your diligence worked there
was due to lightness of their ways.

হুয়ানা ইনেসের প্রচেষ্টার ঠিক তিনশো বছর পর আরেকজন লেখিকা লাতিন আমেরিকার নারীদের উৎসাহিত করেছেন তাদের আনন্দ ও বেদনাকে সঠিক মাধ্যমে প্রকাশিত করতে। তিনি আর্হেন্তিনা-র ভিকতোরিয়া ওকাম্পো (১৮৯০ - ১৯৭৪)। ধনী পরিবারে জাত এই নারী তাঁর সম্পাদিত 'সুর' ((Sur, দক্ষিণ) পত্রিকার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর কাছে আর্জেন্তিনিয় সংস্কৃতির দরজা খুলে দেন। ১৯৩৬-এ তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন উইমেন্স্ ইউনিয়ন। লক্ষ্য আর্জেন্তিনার

নারীদের চেতনা জাগরণ। জীবনীকার ডরিস মেইয়ের (Doris Meyer) ওকাম্পো-র একটি বক্তৃতাকে অবিকল উদ্ধৃত করেছেন তাঁর জীবনীগ্রন্থে, যাতে আমরা ওকাম্পোকে অনেকটাই বুঝতে পারি : 'এযাবৎ আমরা প্রধানত পুরুষদের কাছ থেকেই জেনেছি নারীদের বিষয়ে। কোন বিচারসভা তা বলে এমন সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। কারণ প্রধানত অভিযুক্ত যেহেতু পুরুষরাই, তাই তাদের সাক্ষ্য পক্ষপাতদুষ্ট। নারীরা নিজেরা কিন্তু এসবে প্রায় নীরব। যে অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের প্রতিনিধি এইসব নারী, তাকে আবিষ্কার তো ওরা নিজেরাই করবে। একই সঙ্গে ওরা সাধ্যমতো কথা বলুক পুরুষদের সম্পর্কেও, যাদের ওরা সন্দেহ করে। যদি নারী এটা করতে পারে তাহলে বিশ্বসাহিত্যে অপরিমেয় সমৃদ্ধি ঘটবে।'

ওকাম্পোর মতো চিন্তাবিদদের দ্বারা প্রাণিত - লাতিন আমেরিকা লেখিকাদের আন্দোলনের ধরনটা অন্যরকম। যৌন - যথেচ্ছাচার বা নিছক পুরুষ - বিদ্বেষে তা পর্যবসিত নয়। পরিবর্তে সামাজিক প্রায় সব বিষয়কেই তাঁরা তাঁদের চর্চার সীমায় এনেছেন। তাঁদের প্রায় সবারই চেতনায় গোঁড়ামিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন। ওকাম্পো-র পরবর্তী অন্যতম প্রখর কণ্ঠস্বর চিলি-র ইসাবেল আইয়েন্দে যথার্থই বলেছেন, 'লাতিন আমেরিকার লেখিকাদের রচনায় আছে চোখের জল, রক্ত ও চুম্বনের ছোঁয়া।'

দুই

আমরা যদিও প্রচলিত প্রবণতায় 'লাতিন আমেরিকা' অভিধায় সাতাশটি দেশকে মুড়ে দিই, আর এতে হয়তো আমাদের পরিশ্রম কিছুটা কমে, কিন্তু আসলে সেখানকার লেখকদের প্রতি বেশ অবিচারই করা হয় এতে। ব্যাপারটা লেখিকাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ ওখানে প্রকৃত প্রস্তাবে বক্তব্য উপস্থাপনায় ও আঙ্গিকে কোন পৌনঃপুনিক ব্যাপারই নেই। কুবা-র লিদিয়া কাব্রেরা যেভাবে বাস্তবকে তুলে ধরেছেন তার সঙ্গে উরুগুয়াই -এর আরমোনিয়া সোমের্স-এর আকাশ - পাতাল তফাত। চিলির ইসাবেল আইয়েন্দে যেভাবে গল্প বলেন, তার সঙ্গে কিছুতেই আমরা মেলাতে পারি না আরর্জেন্তিনার লুইসা ভালেনসুয়েলা -কে। কলাম্বিযার আলবালুসিয়া আন্হেল্ ব্রাজিলের দিনা সিল্ভেইরা দে কেইরোজের থেকে একেবারেই আলাদা। একইবাবে মেক্সিকোর আম্পারো দালিভা কিছুতেই এদের ভিড়ে হারিয়ে যাবেন না। একথায়, লাতিন আমেরিকা-র প্রতিটি দেশের সংস্কৃতি আলাদা। তারা প্রত্যেকে আলাদা অভিনিবেশ দাবি করে। এখানে যে - কটি নাম উল্লিখিত হল তাঁরা প্রায় সবাই বহুলপঠিত লেখিকা। এঁরা যে-বাস্তবে বেড়ে উঠেছেন তার সঙ্গে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের বাস্তবের মিল আছে। কিন্তু মিলটুকুই সার। বাস্তবকে দেখার চোখ ও পরিবেশনের ধরনে তাঁরা আশ্চর্য নিজস্বতায় আমাদের চমকে দিচ্ছেন। যেমন, মেক্সিকো-র আম্পারো দাভিলা গোটা একটা জাতির যন্ত্রণাকে একেবারে মূলে - স্থূলে ধরেছেন Haute Cuisine গল্পে বিশেষ ধরনের এক ভোজ্য প্রাণীকে রান্নার বর্ণনায়। এ-প্রসঙ্গে আমাদের মুর্গি বা কইমাছ রান্নার কথা মনে পড়ে যেতে পারে। মেক্সিকোরই কার্লোস ফুয়েন্তেসের একটা অসামান্য গল্প পড়েছিলাম বহুকাল আগে— The cost of living. কিন্তু লাতিন আমেরিকার 'রাজনৈতিক বাস্তব' -এর ওপর নির্ভর করে লেখা এ-গল্পে আম্পারো দাভিলার মতো শিল্পের ছোঁয়া ছিল না। রান্নার কড়াইয়ে চাপানোর পর তার আর্তনাদের ডিটেল শুধু কতক চরিত্রকে কেন, পাঠকের বোধকেও সমূলে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

রাজনৈতিক বাস্তবকে কোন সৎ সাহিত্যিকের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না। আর এই বাস্তবকে পরিবেশন করতে গিয়ে বিশেষ রাখঢাক করে কথা বলা ধাতে নেই কারো - কারো। যেমন কলাম্বিযার আলবালুসিয়া আন্হেল্। চিলে-র ইসাবেল্ আইয়েন্দে। আল্বালুসিয়া আন্হেল্- এর রচনা অনেকটাই পার্টিজান লিটারেচার। একটা ব্যাপার এখানে লক্ষণীয় যে, গার্সিয়া মার্কেসের দেশের মানুষ হয়েও আল্বালুসিয়া আন্হেল একেবারেই অন্যস্বরে কথা বলেন। তাঁর গল্প জাঁকালো দৃশ্যের প্রদর্শনী বা জাদু - বাস্তবতার কুয়াশাঘেরা নয়। গল্পের জন্য তাঁর খুব বেশি পরিসর লাগে না। কোন একটি চরিত্রের বিশেষ মুহূর্তের ছবি বা অনুভবের রূপায়ণ তার গল্পের লক্ষ্য। 'গোরিলারো' নামে গল্পে যেমন এক নারী—যার চেতনায় কোন বিপ্লবীর সঙ্গসুখের স্মৃতি— আত্মকথনের ভেতর দিয়ে গোটা একটা দেশের রাজনৈতিক বাস্তবকে তুলে আনছে। এরকম লেখার মতো পটভূমি কি আমাদের এদেশেও নেই? অভাব শুধু সাহসের। আন্হেল এই সাহসটা দেখাতে পারেন। তাই তাঁদের মাঝে - মাঝে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে হয়। দেশান্তরী হতে হয়।

আরহেন্তিন-র লুইসা ভালেনসুয়েলা-র I'm Your Horse in the Night গল্পটির গল্পটির সঙ্গে আলবালুসিয়া আহেলের গল্পের মিল বিষয়বস্তুতে। কিন্তু বিষয়বস্তুর ট্রিট্মেন্টে তফাত হয়ে যাচ্ছে দুজনের মধ্যে। আন্হেল যেখানে সময়ের দাবিতেই প্রখর উচ্চারণে কথা বলেছেন সেখানে লুইসা ভালেনসুয়েলার গল্পে কবিতা ছায়া ফেলছে। গল্ কোস্তার একটা গান 'A noite eu so teu cavalo' (রাতে আমি তোমার ঘোড়া) বারবার ফিরে আসছে গল্পে। এখানেও আত্মকথনে নিবিষ্ট এক নারী। তার প্রেমিকও বিপ্লবী। প্রেমিকের সঙ্গ তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়। স্বপ্নে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে কাসাকার নেশা, গল্ কোস্তার গান আর প্রতি রাতে ঘোড়া হয়ে প্রেমিককে বহন করার বাস্তব। তাকে ইন্টারোগেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে দেগে দেওয়া হয়েছে শরীর। সে জানে না, তার প্রেমিক বেতো বেঁচে আছে কিনা আজো। তবে এটুকু জানে সে, শত প্রশ্ন ও অত্যাচারেও ওরা তার সেই মহার্ঘ্য স্বপ্নের

হদিশ পাবেন না। স্বপ্নটা গতকালের, কিংবা আবহমান। স্বপ্নে সে বেতো-কে এই কালকেও বহন করেছে। রাজনৈতিক বাস্তব নিয়ে লেখার একটা বিপদ আছে। কলমের বিশেষ জোর না থাকলে অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব স্থূল সীমা ছাড়াতে পারে না। ভালেন্‌সুয়েলার কলম সেটা পেরেছে। তাই যে-কোন আজকের গল্প সংকলনে তিনি প্রায় স্থায়ী পছন্দ।

উরুগুয়াইয়ে আর্মেনিয়া সোমের্স বাণিজ্যসফল লেখিকা নন। পেশায় তিনি শিক্ষিকা। টিচিং ম্যানুয়াল লিখে সময় কাটিয়েছেন একসময়। লেখার জগতে তিনি কোনরকম শর্তের সঙ্গে আপোস করেননি। আন্‌হেল্ রামা, বিশিষ্ট সমালোচক, তাঁর সম্পর্কে গবেষণালব্ধ সত্য যেটুকু তুলে ধরেছেন তাতে কারো - কারো বিচারে তিনি প্রাচীনপন্থী। আজকের কল্পনা ও ভাবনা যোড়শ শতকের কবির ভাষায় ফুটিয়ে তুললে যে - ব্যাপার হয় তাই ঘটেছে তাঁর লেখায়। পরাবাস্তবের লেখিকা বলে চিহ্নিতও হয়েছেন মাঝে - মাঝে। তার মধ্যেই একটা - দুটো লেখায় ঝড় তুলে দিয়েছেন। যেমন The Fall (পতন)। এটা পড়ে ব্লাসফেমি-র গন্ধ পেয়ে ভ্রু, কুঁচকেছিলেন অনেকে। তাঁর অপরাধ, এখানে তিনি ভার্জিন মেরির প্রস্তর মূর্তিকে হঠাৎ মানবীতে রূপান্তরিত করে এক খুনি কালো মানুষের সঙ্গে শারীরিক মিলনে লিপ্ত করেছেন। এখানেও রাজনৈতিক বাস্তব, শ্রমিক - মালিকের সংঘাত ইত্যাদি এসেছে। এসেছে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ছুটে বেড়ানো দুর্বৃত্ত দল। কিন্তু বাস্তবের সবকিছু প্রতীকের মোড়কে, ব্যঞ্জনার রসায়নে শিল্পের মাত্রায় উঠে গেছে। খুব স্পষ্ট করে, প্রাঞ্জল করে কোন কিছু বললে আর যাই হোক সাহিত্যপদবাচ্য সৃষ্টি হয় না। এসব সামান্য যে-কজন বোঝেন তাদের মধ্যে সোমের্সরা উজ্জ্বলতম।

সবশেষে একজন গল্পকারের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তিনি চিলে -র ইসাবেল্ আইয়েন্দে। আজকের লাতিন আমেরিকায় যদিও তাঁকে আদর্শ করে এগোতে সরবে অস্বীকার করেন কেউ (মেক্সিকো-র হোরহে ভোল্‌পি যেরকম), তবু তাঁর সৃষ্টির কিছু যায় আসে না তাতে। তিনি যে পরিবারের মানুষ সেই পরিবার চিলের ইতিহাসের এক গৌরবময় অংশ। তাঁর পিতৃব্য সালভাদোর আইয়েন্দে গোসেন্‌স্ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত চিলে-র প্রথম মার্কসিস্ট প্রেসিডেন্ট। পিনোচেত -এর লোকেরা তাঁকে খুন করার পর ইসাবেল -ও থাকতে পারেননি চিলিতে। মাঝখানে তো শোনা গেছল পাকাপাকিভাবে ভেনেসুয়েলা-য় আছেন। ফলে অনেক রক্তক্ষরা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে তাঁকে। মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবেই তাঁকে দুনিয়া চেনে। তবু ছোটগল্পেও তিনি প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। সেসব লাতিন আমেরিকার এরকম চেনা বাস্তবেরই রূপায়ন যা আদতে ছেঁড়া স্বপ্নের বাস্তব। সেজন্যই বোধহয় ইসাবেলদের নিয়ে আজকাল প্রশ্ন উঠছে। সে উঠুক। এতো সাহিত্যের চলমানতার লক্ষণ। আমরা বরং ভাবতে থাকি তাঁর Toad's Mouth-এর গণিকা এর্মেলিন্দাকে নিয়ে। তার এত ক্ষমতা যে গোটা একটা বন্দর - শহরের পুরুষদের যোগ্যতার পরীক্ষা নেয়। তার উদ্ভাবিত রতিক্রীড়ায় সারা শহরের পুরুষকুল হেরে যায়, শুধু একজন বাদে। সে আস্তুরিয়ানো। নিস্তরঙ্গ জলে ঢিল পড়ার মতো অভিঘাত জাগিয়ে শহরটাকে কিছু দিন বাঁচিয়ে রেখেছিল এর্মেলিন্দা। আস্তরিয়ানোকে খুঁজে পাবার পর আর কাউকে চিনলোই না সে। আস্তরিযানোর হাত ধরে সে হারিয়ে যায় কোথায়। শহর আবার ডুবে গেল বিবর্ণ পৌনঃপুনিকতায়।

বিস্তীর্ণ শূণ্যতারও ব্যঞ্জনা আছে। গার্সিয়া মার্কেস তাকে লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন। ইসাবেলও। একটা জাতির সলিচিউডকে না বুঝলে শিল্পীর পক্ষে খুব বেশি এগোনো মুশকিল— এই সত্যটাই বারবার প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরা। ইসাবেল -এর The Judge's wife -এর নিকোলাস ভিদাল— যাকে গণৎকার বলেছিল 'নারীসঙ্গে সর্বনাশ হবে তোমার' —এই নিঃসঙ্গতারই বাহক। হোক না সে ভয়ানক দুর্বৃত্ত, তারও কি অন্তশ্চারী অনুভব নেই? সারাক্ষণ বিষাদ ঝিমোনো নিকোলাস ভিদাল বিচারকের বৌকে শারীরিকভাবে গ্রহণ করতে গিয়ে গণৎকারের ভবিষ্যৎ বাণীকেই সত্যি করে ফেলে শুধু নয়, কুহক নিয়ন্ত্রিত জাদু বাস্তবকেও তার ভিত্তি দিয়ে যায়। লাতিন আমেরিকার বাস্তবের চিত্রায়ণ অনেকের অনুভবেই বড্ড ডিপ্রেসিভ লাগে। নিকোলাসকে না পেয়ে তার বৃদ্ধা মাকে শহরের চৌমাথায় খাঁচায় অভুক্ত দশায় বন্দি রেখে দেওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করুন পাঠক। চরমতম মানবাধিকার লঙ্ঘনের বাস্তবের প্রত্যক্ষতায় যে-লেখিকার বেড়ে ওঠা, তিনি কেনই বা রঙীন অবাস্তবের মিথ্যাচারে যাবেন? The Judge's wife-এর ডিপ্রেসিভ বাস্তব, আর যাই হোক, তাঁর সততাকে স্পষ্ট করেছে।

ইসাবেল-রা নারীর সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার কথা বলেন না। তাঁরা পুরুষদের সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে সমাজের দোলাচলকে চিহ্নিত করতে চান। একই সঙ্গে তাঁদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান কোন উন্নত লক্ষ্যে। একধরনের আগ্নেয় প্রজ্জ্বলনকে তাঁরাও যে ধারণ করছেন সত্তায়, সেটা জানানোর অধিকার তো চাই। তাঁরাও যে জীবনের মহিমাকে স্বীকার করেন, সেটা আমরা বুঝবো কী করে যদি না আরেকটু খোলা হাওয়ায় তাঁদের দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া যায়?